শিক্ষক (Teacher)

বৈদিক যুগে গুরুরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। প্রকৃত গুরু হতেন চরিত্রবান, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত, নিঃস্বার্থ, স্নেহপ্রবণ-সহ সকলরকম ভালোগুণের অধিকারী। সেযুগে গুরুরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। এমনকি রাজারাও তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন।

নারীশিক্ষা (Women Education)

বৈদিক যুগে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলের শিক্ষার সমান অধিকার ছিল। মেয়েকে শিক্ষাদান করা ছিল পিতামাতার অন্যতম কর্তব্য। মহিলারাও উপনয়ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারত। যতদিন না-মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে ততদিন তারা পড়াশোনা করতে পারত। অন্যদিকে যারা বিয়ে করত না, তারা সারাজীবন পড়াশোনায় নিযুক্ত থাকত। এমনকি তারা বেদ পড়ানোর অনুমতিও লাভ করত।

উপসংহার (Conclusion)

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা বেদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এর বিষয়বস্তু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বেদ ছাড়াও নানা দিক যেমন—ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, নৈতিকজ্ঞান ইত্যাদি নানা দিকে এই শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় নারীদের যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে এক উদারনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যা পরবর্তীতে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা (Brahmanic system of Education)

ভূমিকা (Introduction)

বৈদিক যুগের শেষে অর্থাৎ প্রান্তীয় বৈদিক যুগে বেদকে কেন্দ্র করেই আর-একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা জন্মলাভ করে, যা ইতিহাসে **প্রান্তীয় বৈদিক শিক্ষা**' বা **ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা** নামে পরিচিত। মূলত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা হল আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নত রূপ। এই যুগের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গুরুগৃহে বসবাসকালে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা আত্মসংযম ও আত্মশৃঙ্খলার দীক্ষায় দীক্ষিত হত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা প্রকট হয়ে ওঠায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শিক্ষার অধিকার থাকলেও শূদ্ররা শিক্ষার অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তাই বলা হয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা, আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো গণতান্ত্রিক ছিল না। এই শিক্ষা ক্রমে অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এই যুগে শিক্ষায় বাস্তব জগতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় 'জীবনের জন্যও শিক্ষা, শুধু মুক্তি লাভের জন্য শিক্ষা নয়'।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Brahmanic system of Education)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল—

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য (Aims of Brahmanic Education)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যগুলি হল:

(i) **মোক্ষলাভ বা মুক্তিলাভ (Salvation):** ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য মুক্তিলাভ বা মোক্ষলাভ। আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়েই এই মোক্ষলাভ ঘটানো সম্ভব।

(ii) **জীবন উপযোগী শিক্ষাদান (Provide Life centric Education):** শিক্ষার্থীদের জীবন উপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে জীবনে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা ছিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এখানে মৃত্যুর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় জীবনের উপযোগী শিক্ষা দান করা হত।

(iii) **ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ (All round development of personality):** প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সুব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলাই ছিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার চরম উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত।

(iv) **সামাজিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন (Preservation and transmission of culture):** সামাজিক বিভিন্ন রীতিনীতি, জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, প্রথা, আইন-কানুন ইত্যাদির সংরক্ষণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালন করা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

(v) **চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ (Character Development):** বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সুচরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত।

(vi) **বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতার বিকাশ (Development of Analytical power):** শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এজন্য ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত।

(vii) **মানবিক সম্পর্কের উন্নতি (Improvement of Human Relationship):** শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটানোও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অন্যতম একটি বিশেষ লক্ষ্য।

(viii) **আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ (Spiritual and Moral Development):** আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব। যার দ্বারা সুচরিত্র ও সুব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি গড়ে তোলা যায়। সেজন্য শিক্ষায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত।

(ix) **ব্যাবহারিক শিক্ষাপ্রদান (Provide Practical Education):** জীবনধারণের জন্য নানাবিধ শিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা তথা ব্যাবহারিক শিক্ষাদান করাও ছিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

পাঠ্যক্রম (Curriculum)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার সমন্বয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা, আর যাবতীয় বিজ্ঞান, শিল্প, কলা ইত্যাদি অপরাবিদ্যা। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, "অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে"—অবিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যার অনুশীলন জগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। অন্যদিকে ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার প্রয়োজন অমৃতত্ব বা চরম শান্তি লাভের জন্য। শুধুমাত্র লৌকিক বিদ্যা বা কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা নিয়ে চললে মানুষের কল্যাণ হয় না। উপনিষদে বলা হয়েছে— "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাং উপাসতে তত ভূয় এব তে উ বিদ্যায়াং রতাঃ।" অর্থাৎ, যারা কেবলমাত্র বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যার অনুশীলন করে, তারা একসঙ্গে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু যারা কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করে, তারা তার চেয়েও অধিকতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

এই যুগে পাঠ্যক্রম ছিল বর্ণভিত্তিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেননা বিভিন্ন বর্ণের জন্য বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম এই সময় প্রচলিত ছিল। এই সময় ব্রাহ্মণরাই কেবলমাত্র বেদ পাঠের অধিকারী ছিল। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বেদ পাঠের কোনো অধিকার ছিল না।

(i) **ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম:** ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে যে সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলি হল— **বেদ, বেদাঙ্গ, সাহিত্য, দর্শন, শ্রুতি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ** ইত্যাদি। এ ছাড়া তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, সর্পবিদ্যা, অসুরবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (রাষ্ট্রনীতি), নক্ষত্রবিদ্যা, দেবতাবিদ্যা (নাচ, গান, বাজনা, প্রলেপ তৈরি) ইত্যাদি বিষয়গুলিও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করতে হত। তা ছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য ও অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণদের **সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ** ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশদভাবে অধ্যয়ন করতে হত।

(ii) **ক্ষত্রিয়দের শিক্ষার পাঠ্যক্রম:** এই যুগে ক্ষত্রিয়দের বেদ পাঠের কোনো অধিকার ছিল না। তাই তাদের পাঠ্যক্রমে বেদপাঠের কোনো স্থানও ছিল না। ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজই ছিল রাজকার্য পরিচালনা করা। এই জন্য তাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে **অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, দণ্ডনীতি, পঞ্চতন্ত্র,**

হিতোপদেশ, রাজপুতদের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলিকে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

(iii) **বৈশ্যদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম:** ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যুগে কৃষিকাজ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যই ছিল বৈশ্যদের প্রধান জাতিগত বৃত্তি। বৈশ্যকে **শস্যবপন, জমির গুণাগুণ নির্ণয়, পশুপালন, বিভিন্ন প্রকার ওজন, ক্রয়বিক্রয়ের নিয়ম, দ্রব্য সংরক্ষণের উপায়, বিভিন্ন প্রকার রত্নের মূল্য নির্ধারণ** প্রভৃতি বিষয় শিখতে হত। এজন্য তাদের পাঠ্যক্রমে **কৃষিবিদ্যা, পশুপালন, বাণিজ্যশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র** ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাদের বেদপাঠের কোনো অধিকার ছিল না।

(iv) **শূদ্রদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম:** ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় শূদ্রদের কোনোরকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের মতো শূদ্রদেরও বেদ পাঠে কোনো অধিকার ছিল না। শূদ্ররা ছিল শিক্ষার দরবারে একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয়। তাদের জন্য দৈহিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ নির্দিষ্ট ছিল। কৃষি ও পশুপালনের কাজে তাদের নিযুক্ত করা হত। তবে বেদে শূদ্রদের অধিকার না-থাকলেও পুরাণে তাদের অধিকার ছিল।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু কখনও ব্যক্তিগত আবার কখনও দলগতভাবে শিক্ষা দিতেন। দলগত শিক্ষাদান কালেও গুরু সমস্ত শিষ্যের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। মহাভারত থেকে জানা যায় সাধারণত পাঁচ জনের বেশি ছাত্রসংখ্যা দলে থাকত না। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। 'শ্রবণ', 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' এই তিনটি প্রক্রিয়া ছিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষণ পদ্ধতির মূল উপায়। এই ব্যবস্থায় মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় উচ্চারণ ও আবৃত্তির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। বলা হত—"আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধদপি গরিয়সী'। তবে না-বুঝে মুখস্থ করা ছিল দোষের। এযুগে শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে গল্পবলা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এমনকি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক যুগের ন্যায় আলোচনা পদ্ধতি, বির্তক সভা, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, স্বশিখন পদ্ধতি ইত্যাদির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **মনু থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায়, 'সর্দার পড়ো' বা 'Monitorial System' নামে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় গুরুপুত্র শিক্ষকতার কাজে পিতাকে অনেক সময় সাহায্য করতেন অথবা অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীরা নবাগতদের শিক্ষায় সাহায্য করত।**

ধর্মীয় অনুষ্ঠান (Rituals)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। নবীন শিক্ষার্থীর শিক্ষা 'বিদ্যারম্ভ' সংস্কার অথবা 'অক্ষর স্বীকরণ' নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হত। পাঁচ বছর বয়সে চূড়াকর্ম বা চৌলকর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ব্রাহ্মণরা ৪ বছর, ক্ষত্রিয়রা

11 বছর এবং বৈশ্যরা 12 বছর বয়স পর্যন্ত গৃহে পিতার তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষালাভ করত। তারপর গুরুগৃহে যেত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য দুটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

(1) **উপনয়ন:** ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষারম্ভ হত তা 'উপনয়ন' নামে পরিচিত। উপনয়নের অর্থ হল সমীপে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ শিক্ষালাভের জন্য গুরুর কাছে শিষ্যকে নিয়ে যাওয়া। মেয়েদেরও উপনয়ন সংস্কার হত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উপনয়ন ব্যবস্থা ছিল। একটি সহজ সরল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। এই **তিন বর্ণের ক্ষেত্রে উপনয়নের অর্থ হল দ্বিতীয় জন্ম**। শিক্ষক সেই দ্বিতীয় জন্ম দান করতেন। এরপর শিক্ষার্থী 'দ্বিজ' হিসাবে পরিগণিত হত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় উপনয়ন ছিল এমন একটি অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ব্রত, সংযম, বেদ, নিয়ম, গুরু ও দেবতার সংস্পর্শে আসতেন।
এই উপনয়ন অনুষ্ঠান সকল বর্ণে একই বয়সে হত না। ব্রাহ্মণ সন্তানদের ৪ বছর বয়সে, ক্ষত্রিয়দের 11 বছর বয়সে এবং বৈশ্যদের 12 বছর বয়সে উপনয়ন দান করা হত। শূদ্রদের উপনয়ন বা বেদ পাঠের অধিকার ছিল না। উপনয়নকালে শিক্ষার্থীকে মস্তক মুণ্ডন করে, কৌপীন ও মেখলা ধারণ করতে হত। শিক্ষার্থী সমিধভার বহন করতে তপোবনে গুরুগৃহে উপস্থিত হত এবং গুরুকে প্রণাম করে তাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ করত। এরপর গুরু তার নাম, পরিচয় জেনে তাকে গ্রহণের উপযুক্ত বলে মনে করলে তবে ছাত্ররূপে গ্রহণ করতেন।

(2) **সমাবর্তন:** প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় 'উপনয়ন' নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষার সূচনা হত 'সমাবর্তন' নামক উৎসবের মধ্য দিয়ে সেই শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষিত হত। সমাবর্তন উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্নাতক হিসেবে পরিগণিত হতেন। এই সময় স্নাতক ছিল তিন প্রকারের। যথা—

(i) **বিদ্যা স্নাতক**— যে বেদ অধ্যয়ন শেষ করেছে অথচ সমস্ত ব্রত পালন করেনি। তাকে বলা হত বিদ্যা স্নাতক।

(ii) **ব্রত স্নাতক**— যে সমস্ত ব্রত পালন করেছে কিন্তু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেনি, তাকে বলা হয় ব্রত স্নাতক।

(iii) **বিদ্যাব্রত স্নাতক**— যে বেদ অধ্যয়নের সঙ্গে সমস্ত ব্রত পালন করেছে তাকে বলা হত বিদ্যাব্রত স্নাতক।

গুরুকুলের পাঠ সমাপ্ত করে বিদ্যার্থী তার সাধ্যমতো দক্ষিণা দিয়ে গুরুর অনুমতি নিয়ে স্নাতক হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। সমাবর্তন উৎসবে গুরু শিষ্যকে ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পাথেয় হিসেবে যে উপদেশ দান করতেন তা সর্বকালে, সর্বদেশে ছাত্রদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপদেশ বলে বিবেচিত। বিনম্র, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কামনা করে গুরু তাঁর শিষ্যকে আশীর্বাদ করতেন।

গুরুকুল (Gurukul)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুকুল বা গুরুর আশ্রমই ছিল শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এই গুরুকুলগুলি জনবহুল এলাকার কোলাহল থেকে দূরে বনের ভেতরে নির্জন প্রকৃতির কোলে গড়ে উঠত।

ধর্মভিত্তিক শিক্ষা (Religious Education)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতি, ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখানো হত।

শিক্ষক (Teacher)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। তৎকালীন সমাজে গুরুরা ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র এবং সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। তবে যে-কোনো ব্যক্তি গুরু হতে পারতেন না। প্রকৃত গুরুকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, চরিত্রবান, মহান, বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত, নিঃস্বার্থ, স্নেহপ্রবণ, ধৈর্যশীল এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হতে হত। এমনকি গুরুকে হতে হত সুবক্তা, প্রত্যুৎপন্নমতি, বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যাদানে পারদর্শী। গুরু তার শিষ্যকে পুত্রের মতো স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করতেন। শিষ্যের ভরণ-পোষণ সুখশান্তির জন্য দায়ী থাকতেন। শিষ্যকে সুশিক্ষা দান করাই ছিল গুরুর ধর্মীয় কর্তব্য।

শিক্ষার্থী বা ব্রহ্মচারী (Pupil)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বা ব্রহ্মচারীদের জীবন ছিল কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ। গুরুগৃহে থাকাকালে শিক্ষার্থীকে চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে কতকগুলি অবশ্য পালনীয় নিয়মকানুন মেনে চলতে হত, যেমন—দিবানিদ্রা, বিলাস দ্রব্য ব্যবহার, মাদক দ্রব্য গ্রহণ, জুয়াখেলা, প্রেমালাপ প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের নিষিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া বেশি তৈল ব্যবহার, অধিকক্ষণ স্নান করা, বাজনা, নৃত্যগীত ইত্যাদি থেকে শিক্ষার্থীকে দূরে থাকতে হত। গুরুর নিন্দা করা বা মিথ্যা কথা বলা ছিল মহাপাপ। গুরুর সম্মুখে থুথু ফেলা, হাস্য-পরিহাস, পায়ের ওপর পা-তুলে বসা, আঙুল মটকানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো, যুবতির শরীর স্পর্শ করা ছাত্রদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। এ ছাড়া গুরুগৃহে থাকাকালীন গুরুর গৃহরক্ষা, যজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ, গোপালন, যজ্ঞাগ্নি রক্ষা, গুরু পরিবারের অন্যান্যদের সেবা করা ইত্যাদি ছিল ব্রহ্মচারীর দৈনন্দিন পালনীয় কর্তব্য। এগুলি ছাড়াও গুরুগৃহে থাকাকালীন ব্রহ্মচারীর আর একটি অবশ্য পালনীয় ধর্ম বা কর্ম ছিল ভিক্ষাবৃত্তি করা। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনয় ও নম্রতাবোধ জাগ্রত করে তোলা যেত।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক (Teacher-Pupil relationship)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল অতি পবিত্র ও মধুর। এককথায় বলতে গেলে, গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। গুরু-শিষ্যের জীবনসত্তা

একই খাতে প্রবাহিত হয়ে এক জীবন্ত ও অমলিন সম্পর্ক গড়ে উঠত। এই সময় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক মূলত কতকগুলি নৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতে সম্পন্ন হত। একদিকে গুরুশিষ্যের রোগশয্যায় পাশে থেকে মায়ের মতো সেবা করতেন, তার আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন, এমনকি বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বিনিময়ে শিক্ষা সমাপ্তে গুরুদক্ষিণা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। অন্যদিকে শিষ্যরাও প্রত্যূষে স্নান সমাপন করে, জপ, আহ্নিক ইত্যাদি সেরে গুরু পরিচর্যায় রত হত। এই সময় আচার্যরা শিক্ষাদানকে একটি পবিত্র সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোনোরকম দেনাপাওনার সম্পর্ক ছিল না। গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই শিক্ষার্থীর জীবন গড়ে উঠত।

শৃঙ্খলাবোধ (Discipline)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর কোনো সমস্যাই ছিল না। কারণ গুরুগৃহে থাকাকালে শিষ্যকে কতকগুলি কঠোর নিয়মকানুন, রীতিনীতি ইত্যাদি মেনে চলতে হত। শিষ্যকে চিন্তায়, কার্যে, কর্মে সংযত জীবনযাপন অভ্যাস করতে হত। ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয়ে উঠত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়মানুবর্তিতার দুটি দিক ছিল— একটি শারীরিক ও অপরটি মানসিক। পোশাকপরিচ্ছদে, নিত্যনৈমিত্তিক কাজে এবং বাধ্যতামূলক ভিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হত শারীরিক বিনয়। অন্যদিকে আত্মসংযম, কৃচ্ছ্রসাধন, নিয়মানুগ জীবন এবং ফললাভে নিস্পৃহতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে উঠতে আধ্যাত্মিক বিনয়।

শাস্তিদানের ব্যবস্থা (Punishment System)

এই শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুকুলের অনুশাসন ও নিয়মকানুন ভঙ্গের দায়ে অপরাধীকে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শাস্তিদান প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যায় করলে শিক্ষার্থীদের সরু দড়ি বা বেত দিয়ে প্রহার করা হত। অনেক সময় অপরাধীকে ভীতি প্রদর্শন, উপবাস, ঠান্ডা জলে স্নান অথবা আচার্যের দৃষ্টির বাইরে নির্বাসন দিয়ে শাস্তি প্রদান করা হত।

পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Examination or Evaluation system)

এইযুগে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কোনো পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তবে বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, বিদ্বজ্জনদের নিয়ে সম্মেলন আয়োজন করা হত। বিতর্ক সভা ছিল প্রতিযোগিতামূলক। তপোবন, রাজসভা ও যজ্ঞক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে বিতর্ক বা আলোচনা সভার আয়োজন করা হত।

বাৎসরিক অধ্যয়নকাল (Annual Study Period)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় বছরের সাড়ে চার মাস থেকে সাড়ে পাঁচ মাস বা ছয় মাস পঠনপাঠনের কাজ চলত। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন বা শ্রাবণ মাসের জ্যোৎস্না পক্ষে পঠনপাঠন

শুরু হত আর পৌষ-মাঘ মাস পর্যন্ত এই অধ্যয়ন পর্ব চলত। পঠন পাঠন শুরুর অনুষ্ঠানকে বলা হত **উপকর্মন** এবং পঠনপাঠন শেষ করার অনুষ্ঠানকে বলা হত **উৎসর্জন**।

শিক্ষাকাল (Period of study)

উপনিষদে বেদ পাঠের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক-একটি বেদ নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ করতে প্রায় চার বছর ধরে পড়াশোনা করতে হত। পরবর্তীকালে বেদ পাঠের জন্য 12 বছর সময় নির্ধারিত হয়। 12 থেকে 16 বছর বিদ্যাভ্যাস করার পর প্রায় 24 বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত।

ছুটি (Vacation)

এই যুগেও ছুটির প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ, রাজার মৃত্যু, রাজপুত্রের জন্ম বা মৃত্যু, রাজার পরাজয়কালে গুরুকুলের পঠনপাঠন বন্ধ থাকত। তা ছাড়া উপকর্মন ও উৎসর্জন অনুষ্ঠানের সময়ও পঠনপাঠন বন্ধ থাকত। পরবর্তীতে ছুটির দিন কমিয়ে দেওয়া হয়।

বেতন ব্যবস্থা (Salary System)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। বেতনভুক্ত শিক্ষক তৎকালীন সমাজে নিন্দিত হতেন। শিক্ষার্থীরা ভিক্ষা করে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করত। রাজারা গুরুকুলের ভরণ-পোষণের জন্য গ্রাম দান করতেন। তবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুদক্ষিণা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় শিষ্যরা গুরুকে তা প্রদান করত। ভূমি, গাভি, অশ্ব, পাদুকা, আসন, শস্য, কাংস দ্রব্য দিয়ে গুরুর সন্তোষ বিধান করা যেত। শিষ্যের কাজে ও ব্যবহারে গুরুর সন্তুষ্টিবিধানই তার প্রকৃত গুরুদক্ষিণা।

নারীশিক্ষা (Women Education)

বৈদিক যুগের তুলনায় ব্রাহ্মণিক যুগে নারীশিক্ষা কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। যদিও এযুগেও নারীরা বেদপাঠ করতেন, এমনকি অধ্যাপনার কাজও করতেন। এ ছাড়া বয়ন, সূচিশিল্প, চারুশিল্প, নৃত্যগীত ও বাদ্য ইত্যাদিতে ব্রাহ্মণ্য যুগের নারীদের পারদর্শিতার কথা জানা যায়।

শিক্ষাকেন্দ্র (Education Centres)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুকুলই ছিল শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তবে পরবর্তীকালে কতগুলি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। যেমন—তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, কাঞ্চী, মিথিলা, নবদ্বীপ ইত্যাদি।

অবদান (Contribution)

এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর সমন্বয়ী ক্ষমতা ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ, রাষ্ট্র ও দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক,

ইহলৌকিক এবং ব্যাবহারিক সর্বদিকের প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিল। সংরক্ষণ ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থাকে দীর্ঘজীবী করেছিল। তাই বৈদেশিক আক্রমণে এই শিক্ষার মূলতত্ত্ব ও সংগঠন ভেঙে পড়েনি। রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকায়, সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা থাকায়, শিক্ষকের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় রাষ্ট্রনৈতিক ওথান-পতনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন হয়নি। শিক্ষার উপর শিক্ষকের পূর্ণ কর্তৃত্ব, গুরুকুল প্রতিষ্ঠা, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব, বেতনহীন শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে মর্যাদা, শিক্ষায় নারীর সমানাধিকার, শিক্ষার মধ্য দিয়ে নৈতিক আধ্যাত্মিক বিকাশসাধন প্রভৃতির মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা (Buddhistic System of Education)

ভূমিকা (Introduction)

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে আর-একটি গৌরবময় যুগ হল বৌদ্ধ শিক্ষার যুগ। গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রতিবাদ স্বরূপ যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছিল, তাই ইতিহাসে **'বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা'** নামে পরিচিত। গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈপ্লবিক পরিবর্তন মাত্র। কারণ হিন্দুধর্মের গর্ভেই বৌদ্ধধর্মের জন্ম। প্রকৃতপক্ষে বাহ্মণ্য ধর্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না-ঘটিয়ে ওই ধর্মের সংস্কারসাধন করাই ছিল বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে হিন্দুধর্মের বহু তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মেও স্থান লাভ করেছিল। সুতরাং বলা যায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ পথবিচ্ছেদ নয়, পুরাতন হিন্দু ধর্ম থেকে উদ্ভূত নতুন পথনির্দেশ মাত্র। ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধই প্রথম সার্থক প্রতিবাদ করেন এবং ভারতবাসীর জীবনে ও ধ্যানধারণায় এক নতুন পথের সন্ধান দেন। ("It was Gautam Buddha who rose in open protest against the power and ritual of the Brahmanas and thus introduced a new force into Indian life and thought.")

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিহারকেন্দ্রিক বা সংঘভিত্তিক শিক্ষা। বৌদ্ধ মঠ বা বিহারগুলিই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের শুরু হত 'প্রব্রজ্যা' নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ৪ বছর বয়সে শিশু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীদের **শ্রমণ** বলা হত। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় গণশিক্ষা (Mass Education) প্রসারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই যুগে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি (Salient Features/Characteristics of Buddhistic System of Education): ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মতো বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থারও